সাধন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্ববিশ্ব ও জীবনভাষ্য

শুভঙ্কর ঘোষ

সাড়ে তিন দশক ব্যাপী, নিরবচ্ছিন্ন লেখালিখি সূত্রে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য জিজ্ঞাসা গড়ে উঠেছে নানা মাত্রিকতায়। একথা ঠিকই, এই লেখক গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে নানা সময়ে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়, বরং গভীর ভাবে নজর দিলে বোঝা যাবে তাঁর তত্ত্ববিশ্ব ও জীবনভাষ্যে কোনও অসংগতি নেই; দেখা যাবে তঁার সাহিত্যভাবনার পরম্পরায় স্বচ্ছতা আছে; তাঁর চিন্তাদর্শ ও সৃজনকর্মের সম্বন্ধসেতুতেই তাঁর সাফল্য।

১৯৬৬ সালে ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ২২ বছর বয়সে তাঁর লেখক পরিচিতি। পদার্থবিদ্যায় স্নাতক সাধনের ওপর মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রভাব বেশ কার্যকর হয়েছে। কিন্তু যত দিন গেছে, পরিণতির পথে সাধন, অবিরল তাঁর অন্বেষণ স্বকীয়তা অর্জনে; আজো তাঁর ক্ষান্তি নেই। একজন লেখকের হয়ে ওঠার সাধনাই যে বড় ব্যাপার, শিল্পের রণাঙ্গনে ক্ষতবিক্ষত হয়েও জয়ের আকাঙ্খা যে নিভে যেতে পারে না, এ অভিজ্ঞতাই সাধনের। সাধনের সাহিত্যবীক্ষা ও জীবনবীক্ষায় যে সামঞ্জস্যস্থাপনা তা অবলীলায় ঘটে নি; তার পেছনে রয়েছে একজন যোদ্ধার রণকুশলতা, সময়চেতনা, পর্যবেক্ষণশক্তি ও সমাজমনস্কতা। এইসব সম্পদ নিয়েই তো সাধন লেখক হয়েছেন। সাধন বলেন,

যে কোনও লেখকের হয়ে ওঠার পিছনে পড়ে থাকে ২০, ২৫ কিংবা ৩০টি বছর। এই খন্ডকালের পথ ধরে, নানা সামাজিক স্রোত প্রতিস্রোতের অভিঘাতে লেখকের ভাবনার স্তর যেভাবে ভাঁজ খেয়ে-খেয়ে জমাট বাঁধে, আমরা যদি সাবধানে সেই ভঙ্গিল স্তরগুলো খুলতে খুলতে যাই, খুঁজে পাব জীবারে মতো অতীতের স্থিরবিন্দুগুলো---- যা ইতিহাস ও সমাজবিশ্লেষণের আকার উৎস।' (আমার গল্প ভাবনা, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প,প্রতিক্ষণ)।

প্রকৃতপক্ষে যে দেশকালের আবহমন্ডলে সাধন গড়ে উঠেছেন, সময়ের স্তরে স্তরে যে অভিজ্ঞাতাসমূহ অর্জন করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন বড় বড় গণআন্দোলন, মতাদর্শগত সংঘাতে, আর্থসামাজিক ভাঙচুর, ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েন, মনুষ্যত্বের হত্যা ও প্রতিরোধ--- এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মননবিশ্ব ও সাহিত্যবীক্ষার সমৃদ্ধ হওয়া; শুধুমাত্র কেতাবী বিষয় নয়, ছাঁচ নয়, সৃজন কতটা হতে পারে ও কীভাবে হতে পারে--- তাও তাঁর চর্চার বিষয় হয়েছে। ফলে, তিনি ব্যাখ্যা দিতেই পারেন--

'ছয়ের দশকে এসে সাহিত্যের যে সামাজিক ভূমিকা বা সাহিত্যে সমাজের যে ভূমিকা তাকে প্রায় শূন্য পর্যায়ে এনে শুধু ব্যক্তি, তার সমস্যা এবং শিল্পবাস্তবতাকে পূর্ণ একটা আলাদা আইডেনটিটি তৈরি করে দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সে সময়ের আন্দোলনগুলোয় কখনও শাস্ত্রবিরোধী, কখনও গল্পের গল্পত্ব থাকবে না-- এসব আমরা দেখি। তো আমি যখন লিখতে আসি এই দুটো ব্যাপারই আমাকে ভাবিয়েছে।' (শুভঙ্কর ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ' ছোটগল্প অভিজ্ঞতার কোলাজ' প্রব্রজ্যা গল্প ২০০০)

সাধন চট্টোপাধ্যায় ছোটগল্প ও উপন্যাস-- দুটি ক্ষেত্রেই স্বমহিমায় স্থিত। তবে গল্পকার হিসেবে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত তাঁর দুই শতের অধিক ছোটগল্প; কেন গল্প বেশি লেখেন এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত--

'গল্প আমরা উপন্যাসের থেকে বেশি লিখি। কারণ আমরা প্রতিমুহূর্ত যে বাহ্যিক এবং ব্যক্তিজীবনের সংকটগুলো দেখি সেই ছোট ছোট ঢেউগুলো, ঢেউয়ের মাথাগুলো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে অনেক বেশি করে চোখে পড়ে। তাই গল্প অনেক বেশি লিখতে হয় আমাদের। আর আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ওই চারের দশকের মতো একটা টোটাল কাহিনী দেখাটা আমাদের পক্ষে কোনওদিনই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ছোটগল্প হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কোলাজ।'

এই যে ছোটগল্পকে সাধন কোলাজ বলছেন, এই বলার মধ্যে তাঁর ছোটগল্পের প্রণায়ন প্রণালীর ধারণাও স্পষ্ট ভাবে থাকছে। তাই তাঁর ব্যাখ্যা---

'সেই কোলাজটা যখন আমি তৈরি করব পাঠকের কাছে তা একটা সিঙ্গল অভিজ্ঞতা মনে হবে। বিভিন্ন দেশকালের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করতে করতে এসে একটা বিশেষ মুহূর্তে সেই অভিজ্ঞতার একটা গুণগত রূপান্তর লেখক দেখতে পান। তখনই কিন্তু ছোটগল্পটা তার মধ্যে ফ্ল্যাশ করে যায়। এই গুণগত রূপান্তরের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে কাল সমাজের একটি পটভূমিকা। কারণ কোনও এক ব্যক্তি, সে তো দেশকালের কোনও স্থান াঙ্কে বাস করে। তাকে তো আমরা স্থাপন করব একটা নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট সমাজ এবং নির্দিষ্ট ভাবনার মধ্য দিয়ে। সেইজন্য আমি ব্যক্তির গল্প লিখলেও কিন্তু সেটা ঠিক একটা ব্যক্তির গল্প কখনও থাকতে পারে না। সেই ব্যক্তির গল্প ধরেই তার অতীতের শিকড়-ঝুরির মধ্য দিয়ে দিতে দিতে আমি, আমার সামাজিক চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা সমস্ত কিছুই মিলেমিশে আসে।'

তাহলে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ছোটগল্প কোনও আদিমধ্যঅন্ত্য সমাধিস্থ প্রথাবদ্ধ গল্প নয়। ছোটগল্প একটা আর্ট ফর্ম জীবন থেকে গড়ে ওঠা। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের সাহিত্যচি, সাহিত্যবোধন নন্দন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা যেভাবে গড়ে উঠেছে, সত্তর দশকের লেখকেরা, যেমন সাধন, এই ধারায় পরিপুষ্ট হয়েও জগৎজীবনকে দেখার ও শিল্পনির্মাণের কাজে একই রকম থাকেন নি, সম্ভবত কোনও প্রকৃত লেখকই থাকতে পারেন না। বামপন্থী দর্শনে গভীর বিশ্বাস, ব্যক্তিচৈতন্যের ও সমাজচৈতন্যের টানাপোড়েন নিয়েই নতুন নতুন দিগন্ত অন্বেষণের প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেই তাঁর পথচলা। কিন্তু তাঁর শুটা যেভাবে হয়েছিল, যাত্রাপথ যত অতিক্রম করেছেন ততই তা তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার নবত্বে শিল্প-অভিজ্ঞতার নবত্বে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর ' লেখক আমি' একটাই হতে পারে না, হয়ও নি। তিনি স্পষ্টত বলতে চেয়েছেন--

কোনও লেখকের শু থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সঞ্চার পথ গড়ে ওঠে, বিভিন্ন বিন্দুতে থামে অসংখ্য' লেখক আমি'-- যাঁরা পরস্পর থেকে ভাবনাচিন্তায় কিছুটা ভিন্ন। এবং ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হয়ে যে অসংখ্য ছোট ছোট ' লেখক আমি' দিয়ে যাত্রাপথটি গড়ে উঠেছে-- সবটা মিলিয়েই যোগসূত্রাকারে বড় অস্তিত্বের ' লেখক আমি'টা। লেখকের হয়ে ওঠা তো আমৃত্যু-- আজীবন। সুতরাং কোনও সময়ের বিশেষগুণে যদি বড় ' লেখক আমি'টিকে বুঝতে হয়, যাত্রাপথের অসংখ্য ছোট ' লেখক আমি'-কে ভুলব কী করে? যারা এক একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে যার যার দেশকালটি ধারণ করে আছে? তাই গল্পভাবনা শুধু ব্যক্তির লেখকটির স্মৃতিচারণা নয় নিছক, ব্যক্তির আয়নায় নিকট ইতিহাসের একটি পথ খুঁজে নেওয়া।'

১৯৬৬ থেকে ২০০১--- এই দীর্ঘ সময় ছোটগল্প লিখতে লিখতে সাধনের জীবনতত্ত্ব ও গল্পরীতি, দর্শন ও শৈলী, বক্তব্য ও প্রকরণ বিচিত্রমুখিনতা লাভ করেছে। চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, খাদ্য আন্দোলন, দুটি যুক্তফ্রন্টের গঠন ও পতন, ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধা, ত্রিধা ও বহুধা বিভক্ত হওয়া, 'মধ্যবিত্ত বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া' প্রতিপ্রতিক্রিয়া, সংসদীয়

মুক্তি--- আবার এক বন্ধ্যাসময় সত্তরের দশকে মুক্তির দশক, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বামহত্যা, বামপন্থীদের আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, জরি অবস্থা-- এই সময়কালে সাধনের সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যভাবনায় রূপরূপান্তরের চমৎকার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখালেখিতে তিনি বলেন, 'সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন-- যাদের উপর যতটুকু ঘৃণা গল্পের মোড়কে পুরে দিয়ে দায়িত্ব পালন করলাম।' বলেন, 'সাহিত্যের নান্দনিক প্রস্তুতির চাইতে এখানে রাজনৈতিক উত্ত াপটুকুই বেশি-বেশি আদৃত উৎসাহিত হতে থাকল।' জানালেন, 'বন্যা','দুই বুড়ি' 'নোনা জলের বান'-এর মতো গোটা দশ বারো গল্প লিখলেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্ববিশ্বের সমৃদ্ধি যতই ঘটতে থাকল শ, ফরাসি,লাতিন আমেরিকান সাহিত্যপাঠে, বুঝলেন তিনি, তাঁর গল্পের বাঁধুনি,নির্মাণশৈলী কত কাঁচা, আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদ তাঁকে মার্কেডা, লফো, বোরহেজ-- পাঠে প্রণোদিত করল। গ্রামবাংলা জঙ্গল ও জনপদ, বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করলেন। এ এক অভিজ্ঞতার জগৎ। ' কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয় অবশ্যই, স্রেফ জীবনকে ছেনে গল্প তৈরি করতে' তিনি নিবেদিত হলেন। 'ঢোল সমুদ্র' 'পাতক' 'মেহগনি' 'চিংড়ি' 'আইন নেই' থেকে 'মহারাজা দীর্ঘজীবি হোন'-- অসংখ্য গল্পে এই জীবনের ছবি ছড়িয়ে আছে। এত কথ া বলতে হচ্ছে এইজন্য যে এই সূত্র ধরেই তাঁর সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যদৃষ্টি এখানে সুস্পষ্ট-- 'ব্যক্তিজীবন তো বহুমাত্রিক এবং দেশকালের স্থানাঙ্কে ক্রমশ তা বদলে যায় চি-মূল্যবোধ ও ভাবনার গভীরতায়। সুতরাং গল্পে ওই জীবনকে ধরতে হলে, তা বহুমাত্রিকতায় ধরতে হবে।' এভাবেই আট ও নয়ের দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেকে তিনি ভাঙতে শু করেন, ছে াট ছোট ' লেখক আমি'-র সৃজন ঘটতে থাকে। বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলে যেতে থাকে--

'....আর নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব দিয়ে এ বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশ সম্ভব হবে না। দেহকোষের মতো, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ অখন্ড বলেই ইতিহাস আমাদের প্রতিদিন বেঁচে থাকতে ভীষণ জরি। তাই মানুষের শিকড়ের সন্ধান খুবই জরি হয়ে উঠল আমার কাছে। এবং কল্পনার ভুবন থেকে যে পরাবাস্তবতা উঠে আসে-- যার বিস্তার সীমাহীন-- তাকে ধরেই মা টির বাস্তবের যাত্রাকে চিহ্নিত করতে হবে। ম্যাজিক রিয়ালিজম নিয়ে খুব হৈ চৈ হয় বটে, আমি মনে করি আমাদের দেশের মতো প্রাচীন সভ্যতার ভান্ডারে, সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেই নমুনা অনেক ছড়িয়ে আছে।'

তাঁর নিজের কথাতেই জানানো যায়, এই যে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব, এই সূত্রে ' জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট' 'শহরে বৃষ্টি হয়' 'অদিতির জন্য ৬টি মিডি বাস' 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' ' খেলা চলছে মিড অনে'র মতো রচিলোতেই পাঠ নির্মিত হয়েছে বাস্তব এবং অতিবাস্তবতার একটি আলো-আঁধারির জমিন তৈরি করে।'

তাঁর তত্ত্ব বিশ্বে গল্প কেবল ' গোল গল্প' নয়, গল্পহীনতাও নয়, বরং তিনি এ ব্যাপারে অকপট যে, 'আমাদের তৃতীয় বিশ্বের স াহিত্যে গল্প একটি থাকতেই হবে। তবে কাহিনীরেখাটিকে কে কত সূক্ষ্ম করে নিতে পারেন কিংবা বয়নপদ্ধতি কার কতখানি মজবুত হবে, সে পরীক্ষানিরীক্ষা যার-যার তার-তার। এছাড়া কোনও সাহিত্য সজীব থাকে না বা নতুন মাত্রা লাভ করে ন া। তাই বলে অর্থহীন পরীক্ষার কেদ্দারি পাথরের বুকে শস্য ছড়ানোর নামান্তর মাত্র।.... বেশ কিছু লেখালেখির পর মনে হয়েছিল বাস্তববাদী লেখক আমি, বক্তব্যের নামে কী পৌঁছে দিচ্ছি? না, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের অভিজ্ঞতা। কিন্তু এটাই তো শেষ নয়। বাস্তবেও বিভিন্ন রূপ আছে। যে-কঠিন পদার্থকে বাহ্যত কঠিন দেখছি, তা অণুপরমাণু ও আন্তঃআণবিক শূন্যতায় পূর্ণ। ওর কাঠিন্য যদি সত্য হয়, শূন্যতা মিথ্যে হবে কেন? তাহলে উপরিতলেযা ছিল সত্য, গভীরে বদলে গেল। যাকে চরম বলে মনে হয়েছিল। বুঝলাম এই বাহ্য। তখনই শু হল বাস্তবের উপরিতল থেকে গভীরে নামার প্রস্তুতি।' (আম ার ভাবনা বলে কিছু নেই, উত্তরাধিকার, সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যার এক, জুলাই ডিসেম্বর১৯৯৬)।

সাধন বোঝেন, চাক্ষুষ বাস্তব ও শিল্পবাস্তব-- দুটো আলাদা ধারা। 'দুটোর লজিক দুরকম। লজিকের গোলমাল হলে এক বাস্তব অন্যবাস্তবের সঙ্গে খাপ খাবে না। সুতরাং শিল্পবাস্তবসমৃদ্ধ সাহিত্যে কল্পনার একটি বিশাল ভূমিকা আছে। ....কল্পন ার রামধনু ধরে দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সংযোগের ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক যদি পাঠকদের চেতনায় বাস্তব পৃথিবীর কিছু লজিক প্রতিষ্ঠা করেন, ক্ষতি কি? আসলে শিল্পবাস্তবকেও তার লজিক মেনে সৃষ্টি করতে হবে। নইলে বিশ্বাস্য হবে কেন? যে

গল্প শিল্পবাস্তব ও ইন্দ্রিয়জাত বাস্তবের মধ্যে যোগসূত্রের মাধ্যমে হয় একটা নতুন সত্যে পৌঁছে দেয় পাঠকদের, তাই মহৎ গল্প। জাগতিক বাস্তবের লজিক দিয়ে শিল্পবাস্তবের লজিক বিচার ভুল এবং ক্ষতিকর।' বহির্বাস্তব, প্রত্যক্ষ বাস্তব ও শিল্পব াস্তবের জটিল সম্বন্ধপাতে তাঁর গল্প উপন্যাস গড়ে ওঠে।

সাধন চট্টোপাধ্যায় গল্পগ্রন্থগুলিতে-- মনোনয়ন (১৯৭৬), নাগপাশ(১৯৭৭) নির্বাচিত গল্প (১৯৮১) মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন (১৯৮৪) বেলা অবেলার কুশীলব (১৯৯১) সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ ১, ২ (১৯৯৫, ১৯৯৬)-- বাস্তব, পরাবাস্তব,অধিবাস্তবতার মায়াবাস্তবের মাত্রা ও পরিসর আবিষ্কার করেন-- উত্তীর্ণ করেন নিজের সৃজন কর্মকে শিল্পব াস্তবে। সমসময় সচেতন এই লেখক সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি এক দার্শনিক প্রত্যয়ভূমি থেকে জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ করেন। আর সেখানে তাঁর সময়ভাবনা দেয় স্বাতন্ত্র্য কাহিনী-পটভূমি এমনকি শিল্পকৌশলের থেকে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে লেখকের জীবনদৃষ্টি ও বক্তব্য।' (অলোক রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় সময়ের কথাকার, উত্তরাধিকার, সাম্প্রতিক বাংল া গল্প সংখ্যা এক জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৬)। কিন্তু একটা গল্প নির্মাণের প্রশ্নে, শিল্পকৌশলের প্রশ্নেও তাঁর সচেতনতায় আমর া নিঃসন্দেহ। নান্দনিক চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে তিনি সাহসী ও সতর্ক। তাঁর সাহিত্য ভাবনায় এই প্রসঙ্গটি এখানে উঠে অ াসছে--

'সাহিত্য যেহেতু মানুষের চেতনভূমিকে কাঙ্খিত বিকল্পের স্বপ্ন দেখায়, সেই হেতু এই শক্তিটুকুই ঘষে মুছে, কেবলই পড়ব ার আকর্ষণ এবং কাজ করলে আমানত, ফাঁকা মাথা তৈরিতে, অক্ষর ফাঁকিবাজ বৃহৎ ব্লুপ্রিন্ট ও ইন্ডাস্ট্রির বিদ্ধে দ ায়বদ্ধদের একটি চ্যালেঞ্জ তো আছেই।' (ছোটগল্পের সংকট, নন্দন মে ২০০০)

দায়বদ্ধতা মনে রেখেই সাধন ভাবেন 'শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শ' এই সময়ের লেখকদের লেখায় ঠাঁই পায় না। 'ঘরানা, স্টাইল বা ঢং'-এর অনুপস্থিতি বা গুত্বের অভাব তিনি টের পান অনেকের লেখায়, আখ্যানের বুনুনিতে একরৈখিকতা অনুভব করেন। সাধন সাহিত্যভাবনায় গভীরগামী, সৃজনের ক্ষেত্রে ততোটাই সিরিয়াস, ফলে তিনি সতর্ক করেন এই ভ াবে--

'আখ্যানের সঙ্গে নীরব প্রতিক্রিয়া ঘটে পাঠকের। এই পাঠক কিন্তু একজন মৌলবাদী, খুনী, নারীলোলুপ, কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধীও হতে পারেন। কিন্তু প্রথমেই আখ্যানের শৈল্পিক উৎকর্ষতার সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। আর্টের এই সর্বজনীন শক্তিই তো আমাদের ব্যবহার করতে হবে মহৎশিল্পীর মতো। এ একটি মন্ত্র ফাঁদ। প্রথম দরজা। যদি প্রথম দরজা দিয়েই অতিথি ফিরে যায়, কী করে কুঠুরি ঘরে ঢুকিয়ে, বসিয়ে, আপনি আপনার মনের কথা শোনাবেন, বোঝাবেন?' (ছে াটগল্পের সংকট)।

ছোটগল্পের সংকট নিরসনে দায়বদ্ধ লেখকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে ভেবে নিয়েই সাধন ছোটগল্পের বিশ্বে পদক্ষেপ নিয়েছেন, নিয়ে চলেছেন। তিনি ছয়ের দশক থেকে নয়ের দশকে পৌঁছে ছোটগল্পের চারিত্রলক্ষণ নির্ণয়ে তিনটি মূল বিষয়ের প্রতি জোর দেন-- ১. নির্মাণ ও ভাষা ২. বিষয় ৩. কাল বা সময়ের ব্যবহার। সাধনের গল্পে এসবই উপস্থিত। তঁ ার তত্ত্ববিশ্বে এসবের গুত্বও সমধিক। সংযোগের বিষয়টি সাধনের কাছে গুত্ব পেয়েছে বলেই একসময় তাঁর সূত্রে এ অভিমতও গৃহীত হয়েছে যে 'গল্পের চূড়ান্ত উপাদান ভাষা'। সাধন বিষয়টি এভাবে বোঝেন--

'মনুষ্য চৈতন্য, সমাজচৈতন্য, তার নান্দনিকবোধ, তার আত্মা, তার যুক্তি, তার বিশালত্বে রূপান্তর এসব ধরতে গেলে আম ার ঐতিহ্য, মিথ, শিকড় সমস্ত কিছুকে এনে মথিত করে আধুনিক সময়ের মধ্যে দিয়ে আসতে না পারলে, ভাষাকে নতুনভ াবে না পড়তে পারলে বা মোটা দাগের যে ব্যাপারটা 'সাত'-এ আমাদের করতে হয়েছিল সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে তা যদি না করতে পারি তাহলে আমাদের সাহিত্য বোধ হয় মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছবে না।' (প্রব্রজ্যা, গল্প ২০০০)

আট ও নয়ের দশকে কনজিউমারিজম, সিনথেটিক কালচার, টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দাপট, জনজীবন, সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবন, লেখকের সাহিত্যজীবনে--- জীবনের সব দিগন্তে ছোবল দিয়েছে। মিডিয়া পৃথিবীটাকে ছোট করে নিয়ে এসেছে আমাদের ঘরে, আশিটা চ্যানেল সরাসরি মস্তিষ্কে ও মনে সম্মোহক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় শিল্পসাহিত্যের ভাষা কী হবে এটা ভাববারই বিষয়। সাধন বলেন, ' টেকনোলজির সাথে সাথে ভাষার যে পরিবর্তন আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার কারণ আমরা আস্তে আস্তে তাদের যাপিত জীবনের কথা বলবার সিম্বল এবং সাইনগুলোকে সাহিত্যে আমদানির ও তুলে আনার চেষ্টা করছি। এইটা হচ্ছে তার পজিটিভ দিক। আর নেগেটিভ দিকটা হচ্ছে, টেকনোলজি উইদাউট দ্য ফিলজফি অব সায়েন্স, এটা একটা ভয়ঙ্কর জায়গা।' সাধনের সাহিত্যভাবনায়, সামগ্রিক প্রশ্নেই এই সিরিয়াসনেস লক্ষণীয়।

ভাষা-প্রকরণ-শৈলী, ফর্ম, কনটেন্ট সব নিয়েই সাধনের ছোটগল্পভাবনা, ছোটগল্প লেখা। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূত্রে দামি কথা বলেছেন, 'তাঁর গল্পে ফর্মই একটি মূল্যবোধ প্রকাশ করে, এর সংযোগের মধ্য দিয়ে একটি মেসেজ বা বার্তা পাঠায় ফলে কনটেন্ট হয়ে ওঠে ফর্মাল, আবার ফর্ম কনটেন্টের জন্যই অস্তিত্বপূর্ণ, ফর্ম বার্তার একটি বিশেষ দিক হিসাবেই সক্রিয়। এটা না থাকলে বোঝা যায় না যে সাধনের বর্ণনা, অনুপুঙ্খ অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ, খুঁটিনাটির বিস্তার নয়। ওই রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ক্ষমতাকেন্দ্র ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বগুলি নানাভাবে, নানা পথে সাধন আঁকেন নিজ নির্মাণের তাৎপর্যে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই বিকাশ, এই হয়ে ওঠা, একজন গল্পকারের সচলতাকেই দেখায়।' (সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ভাষার স্বায়ত্তশাসন, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ ২)।

আমরা জেনেছি, সাধন চট্টোপাধ্যায় শুধু গল্পকারই নন, ঔপন্যাসিকও। একথা ঠিকই, গত পঁয়ত্রিশ বছরে, যত দিন গেছে, বাংলা গল্পসাহিত্যে সাধনের আধিপত্য ও শিকড় চারিয়ে যাওয়া উপস্থিতি আমাদের সমীহ আদায় করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর গল্পে কখনও পুনরাবৃত্তি নেই। তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। প্রকৃত লেখক জানেন, এই সমাজ, দেশ, কালপ্রবাহ ছুঁয়ে বিষয় যে বৈচিত্র্য দাবি করে, তা পূরণ করায় প্রকৃত শিল্পক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁকে তাঁর মতন বুঝবে কে? সাধন বলেন, ' লেখককে লেখকের মতো বুঝতে পারা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রয়োজনও নেই তার। সন্দর্ভের ফলে নতুন সত্য জন্ম লাভ করে বলেই সাহিত্য জীবন্ত, চৈতন্যে ক্রিয়াশীল। আমার সত্য অন্যের উপলব্ধিতে নানা কৌণিক সত্যের জন্ম দিলে বোঝা যাবে সৃষ্টি সার্থক।... পরিবর্তনীয় ধ্রুবক হলো লেখকের বোধ-- যেখানে অন্বিত থাকে সমাজ, সময়, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনৈতিক স্থানের পরম্পরা অন্তঃসম্পর্ক। (আমার ভাবনা বলে কিছু নেই , উত্তরাধিকার, সাম্প্রতিক বাংলা গল্পসংখ্যা এক)। এই নতুন নতুন সন্দর্ভ নির্মাণে সাধনের পরম আগ্রহ, মনোযোগ সমকাল, সমাজ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির সংকট সমাজ সম্পর্কিত হয়েই কোন পথে দিশা খুঁজছে তাও তাঁর ধ্যেয়।

ছোটগল্পে তাঁর প্রাতীত অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাধন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস সাহিত্যে নতুন নতুন আখ্যান নির্মাণের মধ্য দিয়ে জীবন থেকে জীবনদর্শনে যাওয়ার পথকেও সুগম করে তুলেছেন। নানা সময়ের আলোচনায় এই জীবনভাষ্যকার সময়-সমাজ-মানুষ রাজনীতি সামনে রেখেই তাঁর তত্ত্ববিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অপরদিকে, তাঁর উপন্যাস সমূহে তত্ত্ববিশ্বের দ্যুতি উপলব্ধি করা যায়। বলা যায়, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব ও জীবনভাষ্যর মেলবন্ধনে, যোগসূত্র নির্ধারণে একটা অনায়াস প্রক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না। সেখানে কোনও চেষ্টাকৃত ব্যাপার নেই। সাধনের এ পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়-- অগ্নিদগ্ধ (১৯৭০), গহীন গাঙ (১৯৭৯), দুই ঠিকানা (১৯৮২) উদ্যোগপর্ব (১৯৮২) পিতৃভূমি (১৯৮৫) পক্ষবিপক্ষ (১৯৮৮) জলতিমির (১৯৯৮) বিন্দু থেকে বৃত্ত (২০০০) মাটির অ্যান্টেনা (২০০০) পাল্টিপুরাণ (২০০১)। এইসব উপন্যাসের মধ্যে লেখকের জীবনবীক্ষা ও সাহিত্যবীক্ষার সংগতি ও সামঞ্জস্য আমাদের টানে। সৎ কথাকার হিসেবে এখানে সাধনের সাফল্য নজর কাড়ে। সাধন তাঁর সমকালীন অনেক কথাকারের মতন রাজনীতি সচেতন, র

াজনীতি মনস্ক। ফলে তাঁর উপন্যাসে নানাসূত্রেই রাজনীতি অনিবার্য প্রসঙ্গ।

সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'উপন্যাসভাবনা'য় স্তব্ধ সময়, স্তব্ধ অতীত ব্যাখ্যায় স্বস্তি বোধ করেছেন তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিতে। উপন্যাসে বড়সড় কাহিনী থাকবে, চরিত্র থাকবে, ঘটনা উপঘটনা থাকবে-- এইটেই এখন সত্য বলে বিবেচিত হয় না। উপন্যাসের ধর্ম আর অঙ্কের নিয়মকে তিনি একাকার করে দিতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, 'স্তব্ধ সময়কে নির্দেশিত করতে পারে কেবলমাত্র উপন্যাসই। ফলে যে ব্যাপকতার আভাস আমরা উপন্যাসে পাই তা কিন্তু বড়সড় কাহিনীর জন্য নয় শুধু।'

উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে থাকে 'স্তব্ধ সময়' যা নাকি আমাদের চলমান বর্তমান সময়কে ভাস্বর, স্বচ্ছ এবং স্পষ্টতর করে তোলে। আর এই চলমান সময়ের সঙ্গে অন্বিত আছে ' দেশ' অর্থাৎ স্পেস; এই স্পেস-এর মধ্যেই আমরা পাচ্ছি রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ, ব্যক্তি জীবন এবং আমাদের শ্রেণীচরিত্র-- সব কিছু।' (উপন্যাস ভাবনা, এবং মুশায়েরা, অক্টোবর-ডিসেম্বর' ৯৬)

একই আলোচনায় সাধন পর পর দুটি গুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন--

১. আমরা উপন্যাস লিখতে গিয়ে, যখনই চলতি ধারণা অনুসারে প্লট-এর কথা ভাবি, তা কিন্তু অতীতের-- সদ্য অতীত কিংবা বেশি অতীত যাই হোক না কেন? এমনকি নিছক আজকের দিনটি নিয়ে লিখতে শু করলেও, লেখার শেষে দেখব তাও অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং উপন্যাসের শিল্পীর কাজই হলো অতীত নিয়ে। কিন্তু অতীত তো ঘড়ির কাঁটার মাথায় ঠিক ঠিক ফস্‌কে যাচ্ছে, কোনওদিন ফিরে আসবে না। মনে হয় শিল্পীর সময়ের মাত্রা এবং ঘড়ির কাঁটার সময় এক নয়। ঘড়ি তো বহিরঙ্গকে মাপবার জন্য বিজ্ঞানের অবদান। সাহিত্যিকই পারে শিল্পের মাধ্যমে 'স্তব্ধ অতীত' তুলে আনতে।

২. মূল আয়োজন 'স্তব্ধ সময়কে' তুলে আনা হলেও, শিল্পীকে জড়িয়ে রাখতে হয় চরিত্র, ঘটনা, ভাব ও ভাবনা। কত বড় আধার লেখক তৈরি করবেন, তা নির্ভর করছে 'স্তব্ধ সময়' টুকু তুলতে যতখানি প্রয়োজন। কারণ এই সময়কে ঘিরেই তো পাঠক উপলব্ধি করবে রাষ্ট্র, সমাজ, জীবন ও ঐতিহ্যের বিস্তারকে। ক্ষমতা, হিংসা, ভালোবাসা কিংবা রিরংসার মতো ব্যক্তিগত 'সাইকি' থেকে সে-মানুষের শ্রেণীচরিত্রের স্খলনপতন, রোগ-ব্যাধির পথে সমাজের প্রতিচ্ছবিই ওই 'স্তব্ধ সময়ের' শরীরে খোদাই করা আছে।'

সাধনের উপন্যাসের ছকও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাঁর তত্ত্বাবি যে প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিতে যাথার্থ্য লাভ করে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসসমূহে তা লক্ষ্য করা কঠিন নয়। 'পিতৃভূমি', 'পক্ষবিপক্ষ' থেকে 'জলতিমির', 'পাল্টিপুরাণ' মাটির অ্যান্টেনা', 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' অবধি তাঁর সৃজনপ্রক্রিয়া এভাবেই অব্যাহত আছে। এসব উপন্যাসে রাজনীতিও বিষয় হয়েছে। সাধন রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার অনিবার্যতাও বোধ করেন। নানা কৌণিক যান্ত্রিকতার ফাঁদে পড়তে চান না। তিনি মনে করেন--

১.রাজনৈতিক উপন্যাসের গুণগত সংজ্ঞা গেছে বদলে। আজ আর ব্যক্তি বনাম দল বা প্রতিষ্ঠান নয়; গোষ্ঠী বনাম গোষ্ঠী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত জরাজীর্ণ হতে থাকবে, নতুন কোনও সামাজিক ব্যবস্থা বিকল্প হবে না যতদিন, গোষ্ঠী সংগ্রাম রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষমতার কেন্দ্রে তীব্র হবে। ব্যক্তি থাকবে গোষ্ঠীর উপগ্রহ হয়ে। এর বলয়ে অবশ্যই থাকবে সম্পর্ক, ভালোবাসা, মূল্যবোধ ইত্যাদি। কারণ এগুলো ব্যক্তির। তাই সময়কে বুঝতে গেলে সঠিক প্রেক্ষিতে ধরতে গেলে মহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস না লিখে উপায় নেই। (আমাদের সময় ও রাজনৈতিক উপন্যাস, অমৃতলোক, শারদসংখ্যা ১৪০২)

২. রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছে দলীয় স্ট্রাকচারে দেখতে পাচ্ছি শ্রেণীগত নতুন বিন্যাস। শিল্পবাণিজ্য থেকে শু করে সাংস্কৃতিক

সংগঠন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, ব্যাঙ্ক, বিচার ব্যবস্থায় এর প্রভাব। এবং এই প্রভাব যে মসৃণ ও নিরঙ্কুশভাবে ঘটছে তা বলা যাবে না। আজ রাজনৈতিক উপন্যাসে এগুলি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আজ রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় পেঁছৈনো যেমন অবাস্তব নয়-- যা তিরিশ বছর আগেও তত্ত্বগত স্তরে ছিল-- ক্ষমতারক্ষা করাও বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও মডেলে পালাবদল ঘটবে অবশ্যম্ভাবী রূপে।' (বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস। সমীকরণ মজুমদার সম্পাদিত 'উপন্যাসশিল্প')

এই ভাবনা যে শুধু ভাবনার স্তরেই রয়ে গেল, তা নয়। অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকায় 'গহীন গাঙ' রাজনৈতিক চেতনায় ও সুরে অন্য মাত্রা পায় শ্রীপদ'র চরিত্রে, ভূপতি ডাক্তারের আহ্বানে, 'কেউ কাউকে বাঁচায় না, নিজেদের বাঁচতে হয়'। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন শক্তির পক্ষ-বিপক্ষ, একই দলের ভেতরে পক্ষ বিপক্ষর লড়াই, দুর্নীতি, ভেদাভেদ,ক্ষমতালোলুপতা, লড়াকু গোকুল ভাংগী, দুলালীর মানবিক উত্তরণ-- সব মিলিয়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের মডেল পরিবর্তিত হয়। সাধনের কথানুযায়ী 'ব্যক্তির স্থলে গোষ্ঠী নতুন শ্রেণীবিন্যাস, অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে ক্ষমতায় থাকার নতুন পরিস্থিতির আভাস' তাঁর পক্ষবিপক্ষের মতন উপন্যাসে 'আংশিক উঠে আসছে।'

সাধন তাঁর ট্রিলজিতে-- 'পক্ষবিপক্ষ', 'জলতিমির' ও 'মাটির অ্যান্টেনা'য়-- তাঁর রাজনীতিবোধ, জীবনদৃষ্টি, সময় ও সমাজ মনস্কতার আশর্চ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি 'জলতিমির' কে যদি আলাদাভাবে সরিয়ে নিই, দেখব এই উপন্যাসে ভারতীয় বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছে। আর্সেনিকের দূষণ গ্রামবাংলার প্রতিদিনের খবর। সাধনবাবুই প্রথম, উপন্যাসে একে ব্যবহার করেছেন, দৈনন্দিনের বাস্তব, ভোগবাদ, আদর্শহীনতা, মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের গ্রামপর্যায়ে থাবা তার সঙ্গে আমাদের চিরজানা কালীয়দমন মিথ নিয়ে উপন্যাসটি সমাজকে বেআব্রু করেছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদের আর্সেনিক দূষণে সমাজতন্ত্রের বিকৃতি, এখানে ব্যাখ্যাত। সাধনবাবু 'আখ্যান একটি জীবন্ত অস্তিত্ব' বলেই দাবি করেছেন। আর সময়ের হাত ধরে মিথ ব্যবহারের তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিতে চান--

আমরা সময়কে ভাঙতে দেখেছি, টুকরো টুকরো গ্রন্থিনী অস্তিত্বে উঠে আসতে দেখেছি, টুকরো হাওয়ার প্রতিত্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের জৈব সময়ের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে বিপুল বিশাল একটি সময়ের সঙ্গে একে যুক্ত করায়। তাই এ সময়ের আখ্যানে জনশ্রুতি, লোক-কাহিনী এবং কল্পকথা বা মিথের ব্যবহার নতুন ভাবে দেখা যাচ্ছে। টুকরো সময়ের সঙ্গে মানবসভ্যতার প্রবাহিত সময়ে সংযুক্তিকরণ কি সাহিত্যে নতুন পথের সন্ধান নয়? মিথকে শুধু ব্যবহারের জন্যই নয়। ভেঙে নতুন সময়ের চরিত্র খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আখ্যান যে জীবন্ত তা প্রমাণ করা হচ্ছে। উঠে আসছে সময়ের দেহকোষে সারিবদ্ধ মৃতে জীবিতকোষেরা এবং নতুন করে জীবন-মৃত্যুর খেলা।' (আখ্যান কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণ জ্যোতির্ময় ঘোষ, সনৎ কুমার নস্কর সম্পাদিত 'বাংলা কথাসাহিত্য')। 'জলিতিমির' উপন্যাসে মিথ ব্যবহারে বহুমাত্রিকতা সাধনের তত্ত্ববিশ্বের ভিত্তিটি পাকা পোক্ত তারই প্রমাণ রাখে।

সাধন এখন, ২০০২ এ পৌঁছে, প্লট নয়, আখ্যান নিয়ে ভাবছেন। 'শৈলী ও বিষয়বস্তুর মিশ্ররূপকে বলা হয় আখ্যান। বিশেষত কথাসাহিত্যে তা উপন্যাস, ছোটগল্পে যাই হোক না কেন-- আখ্যান হচ্ছে কাহিনী ও না-কাহিনীর সমীকরণ'। সাতের দশকে সাধনের আখ্যানে প্লট থাকত বেশি না-প্লটের তুলনায়। 'ক্রমে কেন্দ্রকে ছোটো বানিয়ে না-প্লটের ক্ষেত্রটিকে বিকশিত করেছি কিন্তু পাঠকবৃন্দকে উপেক্ষা করে নয়।' লেখক যা বলবেন সেটাই অমোঘ, পাঠক মাথা নিচু করে তা গ্রহণ করবেন, এই ধারণা ভেঙে, তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশের দশক পেরিয়ে, সত্তরের এঁরা পাঠককে স্বাধীনতা দিলেন। 'আখ্যানের সামাজিকীকরণ ঘটে গেল। সাধনের উপন্যাসতত্ত্বে উপন্যাস ভাবনায় আখ্যান এখন প্রবল বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১-এ 'উজ্জীবনী পাঠমালা'য় তাঁর ভাষণে আলোচনায় আখ্যানের বিস্ফোরক ধারণা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি নির্দ্বিধায় উচচারণ করতে পেরেছেন--

‘সাহিত্যপাঠ নিছক মানসিক তৃপ্তির জন্য নয়, নিছক ব্যক্তিগত ক্ষুধা মেটানো নয়। আখ্যান-এর প্রতিক্রিয়া আমাদের শিক্ষিত করে এবং শিক্ষার বিনির্মাণ ঘটায়। আর এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকলে, পাঠক শুধু সাহিত্যেরই পাঠক থাকেন না, তিনি যার যেমন কর্মস্থলে উৎপাদন ও উন্নয়নের সঙ্গেও অজান্তে যুক্ত হতে পারেন। এখানেই নতুন সাহিত্যের জিত। দৃশ্য-শ্রব্যের বিনোদন যেখানে ভোক্তাকে উৎপাদনবিমুখ করে, সাহিত্যপাঠে আখ্যানের ভূমিকা ইতিবাচক। তাই সত্তরের কিছু লেখক বা পরবর্তীকালেরও কিছু নতুন প্রজন্মের কাছে লেখা অর্থাৎ কথাসাহিত্যে নির্মাণ শুধু ‘ নেশা বা পেশা নয়’ একটি সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বে লেখক-পাঠকের ভূমিকা সম্পূর্ণ পরিপূরক।’

নতুন মতকে, বিকল্প নন্দন বিকল্প ধারা ও ধারণার যাত্রাপথে যে এক-ঝাঁক সত্তরের যাত্রীকে পাওয়া গিয়েছিল দায়বদ্ধ লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আপন বিশ্বাসে জীবনদর্শনে সৎ, সৃজনচর্চায় আন্তরিক, বিগ-হাউসবিমুখ, লিটল ম্যাগাজিনের এই লেখক তাঁর তত্ত্ববিশ্ব ও জীবনভাষ্যে যে সেতুবন্ধন করে চলেছেন, সেও এক অনিবার্য দৃষ্টান্ত রূপে বিবেচিত হতে পারে। সাধন অন্তহীন সাহিত্যপথের অভিযাত্রায় একজন সাহসী পথিক,পথ হাঁটছেন, প্রবীণতায় যৌবনের চোয়ালশক্ত অঙ্গীকার তাঁকে সাহিত্যব্যক্তিত্বের মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করে চলেছে, তাঁর বলা নিরবধি, থামবার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা সাধন জানেন ও মানেন, তাঁরই ভাষায় , ‘ লেখকের হয়ে ওঠা তো আমৃত্যু-আজীবন।’

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com